মাননীয় সম্পাদক, আজকাল

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক মহাশয় করকমলেষু,

১৪০৭ সনের ৯ ভাদ্র (ইং ২৬ আগস্ট ২০০০) আমি আপনাকে একটি পত্র লিখি যার বিষয় ছিল রাজীব-সোনিয়ার কন্যা কল্যাণীয়া প্রিয়াঙ্কার ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে পুত্র সন্তান প্রসবের আগাম সংবাদ। আপনার চিঠির সঙ্গে প্রিয়াঙ্কাকে একটি পৃথক পত্র দিই যাতে ওষুধ ও পথ্য বিষয়ে কিছু পরামর্শ ছিল। হয়ত বিষয়টি আপনার মনে পড়ছে। তবে কাজের সময় অনেক কিছু মাথায় আসে না। সেক্ষেত্রে আমার চিঠির তারিখটি দেখে আপনাদের পাকা খাতার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন। নামে ভুল থাকতে পারে, অনেকেই ভুল করে। আমার নাম নঙ্গরচন্দ্র মেদ্যা, লঙ্গরচন্দ্র মেদ্যা। ভোটের কার্ডে 'লঙ্গর' ছাপা হয়েছে। যে বছর আমার জন্ম (১৩২৯-৩০ সন) ধানের ফলন বেশ ভাল হয়েছিল, বিঘেতে ছমাপ। বাবার মুখে শুনেছি দুটি মরাইয়ে ধান ধরেনি বলে তৃতীয় মরাই করতে হয়। কাজেই গাঁয়ে লঙ্গরখানা খোলার দরকার হয়নি। আর তখন 'লঙ্গর' কথাটি চালুও হয়নি। তখন খরা-ঝরায় অন্নছত্র খোলা হত। তেমনই এক বছরে অন্নদা চক্রবর্তীর জন্ম। অন্নদা অবশ্য গতবছর দেহ রেখেছে। আমার বন্ধু প্রভাকর বেজও আর নাই। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে গাঁয়ের লাইব্রেরিয়ান হয়েছিল। আমার বিদ্যে অবশ্য সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত। তারপর চাষবাস। প্রভাকর প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীতে গিয়ে আমার নামের ইতিহাস ঘেঁটেছিল। বইপত্রে যা লেখা আছে তাতে 'নঙ্গর' মানে নোঙর। ছেলে হয়েছে তাই সংসারের নৌকাখানি খুঁটিতে ঠিকঠাক বাঁধা পড়বে। বোধহয় সেই থেকে নামটি এসেছে। কিন্তু প্রভাকর নোঙরের সঙ্গে চন্দ্রের যোগটি খুঁজে পায়নি। বলেছিল কলকাতায় গিয়ে আরো খোঁজখবর করবে কিন্তু রিটায়ারমেন্টের কবছরের ভেতর দেহ রাখল। প্রভাকরের ইচ্ছেতেই খবরের কাগজে আমার চিঠি লেখার সূত্রপাত। প্রভাকরেরও চিঠি লেখার নেশা ছিল তবে ইংরেজি কাগজে। যাই হোক আপনাদের কাগজে যদি আমার নাম 'লঙ্গরচন্দ্র' লেখা থাকে তাহলে সংশোধন করে 'নঙ্গরচন্দ্র' করে দেবেন। ভোটের কার্ডে কবে বদল হবে ভগবানই জানেন।

আমার বর্তমান পত্রখানির বিষয় অবশ্য ভিন্ন। আপনাদের সংবাদপত্রে ৫ই শ্রাবণ ১৪০৯ (ইং ২২ জুলাই ২০০২) দিল্লির লোডশেডিং নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেই বিষয়ে। আপনার অবগতির জন্য খবরের জরি অংশটি নীচে উল্লেখ করছি ঃ

অটল, সোনিয়ার বাড়িতেও লোডশেডিং!

রাজধানী দিল্লির বেহাল বিদ্যুৎ পরিস্থিতি টের পেলেন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং বিরোধী দলনেত্রী সোনিয়া গান্ধী দুজনেই। শনিবার মধ্যরাতের পর প্রধানমন্ত্রীর রেসকোর্স রোডের বাসভবনে ২০ মিনিট ধরে বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল না। আর সোনিয়ার ১০ জনপথে বিদ্যুৎ ছিল না ৩০ মিনিট।..... কখনও এমনটা ঘটেনি। বাজপেয়ী ও সোনিয়ার বাড়ির সামনে পি সি আর ভ্যান পাঠানোর পর প্রতিটি ভি আই পি-র বাড়ির সামনে রাত সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছে যায় একটি করে পি সি আর ভ্যান। দিল্লির বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বেসরকারীকরণ হওয়ার দন কোথাও লাইনে কোনও গন্ডগোল হলে তা সারাতে ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত লেগে যাচ্ছে। দিল্লিবাসীর রক্তচাপ এতটাই বেড়ে গেছে যে, পারিবারিক জীবনে বা কর্মক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছে।

লোডশেডিংয়ের এই সংবাদটি পড়ে আমি বাজপেয়ী মশাই এবং সোনিয়া গান্ধীকে দুটি পৃথক পত্র লিখব বলে ঠিক করি। পরে ভেবে দেখেছি বাজপেয়ী মশাইকে এই বিষয়ে এখনই পত্র লেখার দরকার নাই। তিনি সাত ঝামেলায় আছেন, পত্রখানি পড়ার সময় পাবেন কিনা বলা মুস্কিল। তাছাড়া এ-বয়সে আলো আর অন্ধকার সব সমান। বরং বেশী আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। বৌমাগুলিকে বলি তোমরা কলাগাছের থোড়গুলি জ্বালাও, আমাকে একটি লণ্ঠন দাও। আশি বছর ধরে বাইরের জগৎ অনেক দেখলুম, এবার একটু ভিতরখানি দেখি। শ্রীমান সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এখন ভরা যৌবন, এসব বোঝার বুদ্ধি নাই। বাজপেয়ী মশাইয়ের চোখ বুজে যাচ্ছে দেখে কিছু মন্দ কথা বলেছিল। সে খবর কাগজে বেরিয়েছিল। একটি পত্রে আমি বুঝিয়ে বলেছি এ-বয়সে জীবনের ধর্ম হল বাইরের জগৎ ছেড়ে ভিতরে ঢোকা। আগে হালের এক-জোড়া হেলে কিনতে কোতুলপুরের হাটে গেছি। পছন্দ না হলে সেখান থেকে উজিয়ে মায়াপুরের হাটে। গর ক্ষুর দেখেছি, দাঁত গুনেছি। পঞ্চাশ জোড়া গ দেখে নিজের পছন্দেরটি কেনা। এখন আর ওসবে মন নাই। ভবনদীর পাড়ে বসে এদিক-ওদিক তাকাই। 'ব্যা' ডাক শুনলে কান ঘুরোই। ভগবান যেটি পাঠাবেন তার ল্যাজ ধরেই যেতে হবে। কালোটি পাঠালে কালো, খয়েরি পাঠালে খয়েরি। বলদ পাঠালে বলদ, বকনা পাঠালে বকনা। ল্যাজটি ছাড়া চলবেনি। সারাজীবন গর মাপ দেখেছি, কাঁধ মেপেছি, দাঁত গুনেছি - এখন বুঝি আসল ব্যাপারটি হল ল্যাজ। ওটি শক্ত করে ধরতে হবে। ছেড়ে দিলে হাবুডুবু। জলে গ সামলানো বড় দায়। এমনিতেই জলে নামতে চায় না, নামলে যেদিক দিয়ে পারে পালাতে চায়। মোষের আবার উল্টো মতি। জল দেখলে চনমন করে, গরমকালে নুন-খোলের বস্তা সমেত পুকুরে নেমে পড়ে। এখন অবশ্য গ-মোষের অর্ধেক কাজ করে দিচ্ছে ট্রাক্টর। কিন্তু ভবনদী পার হতে ট্রাক্টর কাজে আসবেনি। তাই গর চিন্তা, সেই চিন্তা-ভাবনায় দিনে-রাতে চোখ বুজে যায়। কিন্তু ঝুরো ঝুরো ঘুম, দম নাই। মাঝরাতে ছেলেপিলেদের ঘুম গাঢ় হয়, বুড়োবুড়িদের ভেঙে যায়। তখন বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ। পাখির তিন প্রহরের ডাক নিত্য শুনি। প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে মধ্যরাতের পর লোডশেডিং হয়েছে, এতে ঘুমের ব্যঘাত নাই। সন্ধের দিকে ঘুমটি ঝেঁপে আসে, রাত বাড়লে কমে। একেবারে বাচচা ছেলেপিলেদের মতন।

কিন্তু আমার কিংবা বাজপেয়ী মশায়ের মতন সোনিয়া মায়ের দিনগত পাপক্ষয় না। এ বয়সে ঘুমটি ঘন। আমার তিন পুত্রবধূ কিন্তু ভোরে উঠে লাচ-দুয়ারে গোবর-লাতা দেবার সময় কাউকে পাবেননি। আমার পত্নীর যতদিন পায়ের জোর ছিল ততদিন তিন কাঠার উঠোনখানি নিত্যদিন লাতা দিত। দিনকাল বদ্‌লে যাচ্ছে দেখে দু-পাঁজা ইঁট পুড়িয়ে পাকা ঘর তুলেছি বছর পনের আগে। কিন্তু লাচ-দুয়ারে গোবর-লাতা দিতেই হবে। ওপথে মা লক্ষ্মী ঘরে ঢোকেন। কিন্তু ঐ এক চিলতে লাতা টানার লোকও নাই। রাত যত শেষ হয় বউ-ঝিদের ঘুম দুধের সরের মতন ঘন হয়। অবশ্য বড় ছেলের পুত্রবধূটি আসার পর সমস্যাটি খানিক মিটেছে। আলো ফুটার আগেই লাতা দেয়া সেরে ফেলে। তার অবশ্য অন্য ব্যারাম। দিনের বেলা যেখানে পারে খানিক ঘুমিয়ে নেয়। একদিন খড় কাটতে গিয়ে আর গুয়াল থেকে ফেরার নাম নাই। আমার পত্নী ভেবেছে পুরো পালুই কেটে ফেলেছে, কিন্তু অত খড় কেটে রাখলে বাগালটি নষ্ট করবে। এমন জাবনা মাখবে যে গর পেট ছেড়ে যাবে। আমার পত্নী গজগজ করতে করতে গুয়োলঘরে গিয়ে দেখে নাত-বউ খড়ের আঁটিতে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছে। আমার নাত-বউয়ের দাদু যাত্রাদল করেছিল। দলের নাম ছিল 'মা কালী অপেরা'। ছেলে এখন দলটি চালায়। নামটি অবশ্য বদলে 'নটী বিনোদিনী অপেরা' করেছে। ওদের সংসারটি রাতচোরা। তাতেই দিনে ঘুম। ওদের সংসারে গাড়োয়ানকে বলে 'সারথি', গ লাথ ছুঁড়লে 'নরাধম' বলে গাল দেয়।

আমি সোনিয়া গান্ধীকে একটি পত্র পাঠাচ্ছি। দয়া করে ইংরেজিতে তর্জমা করে পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। আমি আমাদের গ্রামে তর্জমার ব্যবস্থা করতে পারিনি। অশোক খাঁ কংগ্রেস করে কিন্তু ইংরেজি করার ক্ষমতা নাই। কিন্তু মানুষজন আজকাল এ্যাড়গা। সত্যি কথাটি পেট খুলে বলবে সে মতি নাই। বলল সোনিয়া গান্ধী ইটালির মেয়ে। ইটালি ভাষায় লিখতে হবে। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি কথাটি সত্যি না। সোনিয়া গান্ধী ইংরেজি জানে। বড় ইস্কুলের ইংরেজির মাষ্টার জীবন মুখুজ্যের কাছে গেলুম। সে বললে সরকার নাকি ইস্কুলের কাজ ঘরে করা বারণ করে দিয়েছে, বলেছে মাইনে বন্ধ

করে দেবে। বিনা পয়সায় কাজ করলেও লোকে বলবে টিউশনি পড়াচ্ছে। বুঝলুম ভয় পাচ্ছে। সোনিয়া গান্ধীর কাছে জীবন মাস্টারের ইংরেজির ভুল ধরা পড়ে যাবে। আমার বান্ধব প্রভাকর বেজ গত হবার পর সত্যিকারের ইংরেজি জানা লোক নাই। শুনেছি কলকাতাতে এখনো বিলেতে পড়া লোকজন মেলে। তাদের কাউকে ধরে তর্জমার ব্যবস্থা করবেন। তবে ঠিক লোকটি ধরবেন, কলকাতার সব লোকের ইংরেজির বিদ্যে নাই। 'ছদ্মবেশী' নামে একটি টকি হয়েছিল। পাশের গ্রামে শ্রীদুর্গা টকিজে দেখিয়েছিল। তাতে উত্তমকুমার ছিল নায়ক। সে ছদ্মবেশ ধারণ করে ভাইরার ঘরে গেসল। ভাইরা হচ্ছে বিকাশ রায়। বড় উকিল। সে উত্তমকুমারকে একটি দশটাকার নোট দিয়েছিল। কিন্তু 'এ টেন রূপি নোট' না বলে শুধু 'টেন রূপি নোট' বলেছিল। বড় ইস্কুলে তখন দুজন ইংরেজির মাস্টার - মোহনবাবু আর জিতেনবাবু। মোহনবাবুর প্র াইভেটে হ্যারিকেন জ্বলে, জিতেনবাবুর হ্যাসাক। মোহনবাবু চা খেতে খেতে জিতেনবাবুকে জিজ্ঞেস করল 'ছদ্মবেশী' দেখেছে কিনা। জিতেনবাবু বলল 'হ্যাঁ'। মোহনবাবু জিজ্ঞেস করল ইংরেজির কি ভুল আছে বলেন দিকি? জিতেনবাবু ধরতে পারেনি। হৈহৈ ব্যাপার। গোটা ইস্কুল ভেঙে পড়ল শ্রীদুর্গা টকিজে। পাঁচ গ্রামের মানুষজন 'ছদ্মবেশী' দেখতে হুমড়ি খেল। জিতেনবাবু হুগলীতে মাস্টারি নিয়ে চলে গেল আর শ্রীদুর্গা টকিজের মালিক নিত্যানন্দ পোদ্দার আরামবাগে কোঠ া বাড়ি তুলল। কাজেই কলকাতাতে থাকলেই ইংরেজি জানবে এমন কথা নাই। তবে উত্তমকুমার ভুলটি ধরতে পেরেছিল। কিন্তু বলে দিলে ভাইরার কাছে ধরা পড়ে যেত। তখন কাহিনী থেমে যেত।

যাই হোক আপনি পত্রখানি তর্জমা করিয়ে সোনিয়া গান্ধীর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। আমি ডাক-টিকিট সহ একটি পৃথক খাম পাঠাচ্ছি। সোনিয়া গান্ধীর ঠিকানা আপনাদের খবরের ভেতরেই দেওয়া আছে - ১০ জনপথ। এখানে পোস্টা পিসের পোস্টমাস্টার জটাধারী বলল দিল্লিতে ১, ২, ৩ ইত্যাদি মহল্লা ভাগ আছে। সোনিয়া গান্ধীর মহল্লাটি আমার জানা নাই। আপনারা খবরের কাগজের লোক, আশা করি সেটি জানতে অসুবিধে হবে না। কলকাতায় কংগ্রেসের অনেক নেতা আছে, ফোন করলে ঠিক খবর পেয়ে যাবেন। এই বাবদ খরচ আমি বহন করতে রাজী আছি, অর্থ সামান্য কিন্তু ঋণ রাখতে নাই। সেই সব থেকে সুখী যে অঋণী।

ভবদীয়
নঙ্গরচন্দ্র মেদ্যা
৭ই শ্রাবণ ১৪০৯
ইং ২৪ জুলাই ২০০২
গ্রাম ও ডাকঘর ঃ গেলিয়া
জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৫৪

পরম কল্যাণীয়া মা সোনিয়া,
'আজকাল' সংবাদপত্রের ৫ই শ্রাবণ ১৪০৯ (ইং ২২ জুলাই ২০০২)-এর একটি খবর মারফৎ অবগত হলুম যে ৩রা শ্র াবণ ১৪০৯, শনিবার তোমার এবং বাজপেয়ী মশায়ের বাড়িতে লোডশেডিং হয়েছিল। তোমার বাড়িতে ৩০ মিনিট এবং বাজপেয়ী মশায়ের বাড়িতে ২০ মিনিট বিদ্যুৎ ছিল না। খুবই ভাবিত হলুম। তুমি অবশ্য আমাকে চিনবে না। তবে তোমার শাশুড়ি মাতাকে আমি দেখেছি। খোলা জিপ গাড়িতে চড়ে কলকাতা থেকে বিষ্টুপুর হয়ে বাঁকুড়া গেসল। সে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। আমাদের গাঁয়ের পাকা রাস্তার মোড়ে খানিক দাঁড়িয়েও ছিল। ডাক্তার ভবতোষ মুখোপাধ্য ায়, এল. এম. এফ. (ক্যাল), মালা দিয়েছিল তোমার ঠাকুমার গলায়। সেই কথাটি কাজের মেয়েটি চুপিসাড়ে ভবতোষ ড াক্তারের বউয়ের কানে তুলে দেয়। ডাক্তার রাতে ঘরে ফিরে দেখে বউ বাপের-ঘর চলে গেছে। একমাস কাটিয়ে, রাগ পড়তে, ফেরৎ আসে।

আমার নামটি অবশ্য অন্য কারণে তোমার শোনার কথা, বিগত ৯ই ভাদ্র ১৮০৭ (ইং ২৬ আগস্ট ২০০০) খবরের কাগজে তোমার কন্যা প্রিয়াঙ্কা-মায়ের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সংবাদ পড়ে আমি ওকে একটি পত্র দিই। তাতে কী কী বিষয়ে সাবধান হতে হবে তাও লিখে জানাই। তোমার শাশুড়ি-মাতা নাই, তুমি সাত কাজে থাক তাই প্রিয়াঙ্কা-মাকে পরামর্শগুলি পত্রে জানাই। আগে রাজারা মাঝরাতে ছদ্মবেশ পরে প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখতে বেরত। প্রজারাও গাছের আম-জাম রাজার ঘরে দিয়ে আসত। রাজার ছোট মেয়েটি মুচিদের মেজ মেয়েটির সই। মুচিদের মেয়েটি সইয়ের ঘরে গর ঠ্যাং পাঠিয়েছে। মা ষষ্ঠী ঠ্যাংটিকে আম-কাঁঠালের ঝুড়ি করে দিল। এখন সংসারটি বড়, দেখা-সাক্ষাৎ নাই বললেই চলে। কিন্তু সম্পর্কটি আছে। আমার পত্নী পায়ের বাতে সাত বছর বাপের ঘর যেতে পারেনি কিন্তু তা বলে বাপের ঘরটি পর হয়ে যায় নি। এই সেদিন আমার বড়শালার নাতি চল্লিশ মাইল সাইকেল গড়িয়ে এক কাঁদি কলা দিয়ে গেছে। কলাগুলির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে আমার পত্নীর সে কি কান্না! ফল্গুধারার মতো বালির নীচে সুখ-দুঃখ ভাব-ভালবাসা চাপা পড়ে থাকে। সময় মতন বান ডাকে। আমাদের গ্রামের দেবেন নন্দীর নাতনির হার্টে ফুটো বেরিয়েছিল। তোমার শাশুড়িমাতা তখন প্রধানমন্ত্রী, চিঠি পেয়েই দশহাজার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। মানুষজনের দুঃখকষ্ট সবই বুঝত। পাঁচ কাজে সর্বদা খোঁজ করার ফুরসৎ ছিলনি।

তোমার বাড়িতে ৩০ মিনিট বিদ্যুৎ ছিলনা এ-বড় চিন্তার কথা। কাগজে লিখেছে বেসরকারীকরণের পর এই দুর্ভোগ। আমাদের বিদ্যুৎ না থাকলে সব কর্মেই গন্ডগোল। মাথার ওপর পাখা বন্ধ। কাজের মানুষের তাতে চিন্তা নাই। খাটুনির শরীরে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়বে। ঝামেলা কোলের বাচচাগুলিকে নিয়ে, মায়ের হাতপাখাটি বন্ধ হলেই চিলচ্যাচন চেঁচাবে। দোষ দেবার কিছু নাই। এখন জন্ম থেকে আয়েসি শরীর। পাখা বন্ধ হলেই গায়ে ঘামাচি আর ফোঁড়া। ঘরে শ্বেতচন্দনের ব্যবস্থা রেখো। সাদা চন্দন বাটা ঘামাচি-ফোঁড়ার মহৌষধ। অবশ্য ভাদ্রটি পেরিয়ে গেলেই হিম পড়বে। তখন পাখার দরকার নাই। মাঝরাতে পাখা বন্ধ করতে ভুলে গেলে জ্বর এসে যাবে।

রাতে আলো গেলে অন্য এক ঝামেলা আছে। চোর-ছ্যাঁচোর ঘরে ঢোকার পথ খোঁজে। আমাদের গ্রামের তিন মোড়ে তিনটি ডুম আলো দিয়েছিল পঞ্চায়েত থেকে। রাতের কারবারীরা ওগুলি খুলে নিয়ে গেসল প্রথম বছরের প্রথম মাসেই। তারপর আর দেয়নি। কতবার দেবে? আর আলো চলে গেলে চোরদের মহানন্দ। তখন ঘর-বার সব অন্ধকার। গত বছর তেমনই এক রাতে বর্ষাও নেমেছিল তেমন। এক হাঁটু জল। ব্যাঙের ডাকে কান পাতা দায়। বসন ময়রার নাতিটি ঝোঁক ধরেছে ব্যাঙ ধরে দিতে হবে। বাপ-মা বকে থামাতে পারেনি। পিটুনি খেয়ে ছেলের আরো কান্না। ওদিকে দাদুর কানে গেছে। ওপর থেকে নেমে নাতিকে বগলে করে ব্যাঙ ধরতে গেছে চিমটে হাতে। জিলিপির প্যাঁচে হাত সড়গড় কিন্তু ব্যাঙ ধরা অন্য বিদ্যে। সে পারে বিনোদ লুয়োর। নিত্যদিন জোঁতাতে ব্যাঙ গেঁথে মাছ ধরে। বসন ময়রা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেছে অনেকদূর। শেষে ধরেছে একখানি। নাতি-দাদুতে সে কি ফূর্তি। নাচতে নাচতে ঘরে এসে দেখে রসগোল্লার আধমণি কড়াটি হাওয়া। দরজা খোলা পেয়ে যার ঝাড়ার ঝেড়ে দিয়েছে। তোমাদের অবশ্য সে চিন্তা নাই। আলো গেলে পুলিশের গাড়ি আসে। কিন্তু পুলিশ থাকলেই সব চিন্তা মিটে গেল এমন ভেবে লাভ নাই। আমাদের গ্রামে মাঝে খুব চুরিচামারি হচ্ছিল। থানা থেকে ছোটবাবু এসে রাতে হাটচালায় মিটিং করল। রাতপাহারার জন্যে টর্চ আর বল্লম দিল। ফেরার সময় গাড়িতে উঠে দেখে কাজুবাদামের থলেটি নাই। ছোটবাবু থানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে করে পাকা রাস্তা ধরে আসছিল। উল্টোদিক থেকে একটা লরি যাচ্ছিল কলকাতার দিকে। চোখে আলো লাগছিল বলে ছোটবাবুর ড্রাইভার হাত নেড়ে আলোর জ্যোতি কমাতে বলেছে। লরিটি কথা বুঝতে না পেরে এক থলে কাজু ফেলে দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলে গেছে। সেই মুখবন্ধ থলেটি ছিল ছোটবাবুর গাড়িতে। গাড়ির গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কে মেরে দিয়েছে! লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেল। আলো চলে গেলে সজাগ থাকতে হবে। পুলিশের ওপর ভরসা নাই। পাঁচগাড়ি পুলিশ থেকেও তোমার সংসারের বিপদ সামাল দিতে পারেনি।

অন্য আপদও আছে। সংসার ছেলেপিলে নাতিনাতনী তাই ঠাকুরদেবতার নানা উপোষ। মন্থন ষষ্ঠীর দিন দুপুরে

তিলতেলের লুচি হবে। সকালবেলায় দশসের তিল দিয়ে এলুম কলে। চাকাটি একপাক ঘুরেছে কি ঘুরেনি, লাইন চলে গেল। বসে আছি এসে যাবে বলে। আর দেখা নাই। মুড়ি খেতে গেলুম ঘরে। তারপর এক পণ খড়ের বিচেলি পাকালুম। দুপুর পেরিয়ে গেল। লাইন আর আসেনি। গিন্নি বলে ভাতে বস। সে কি আর হয় পুত্রবধূ নাতবধূগুলি শশা-শাঁকালু চিবিয়ে বসে আছে, আমি কি করে ভাত খাই দুটি মুড়ি ভিজিয়ে খেলুম। রাতে লাইন এল। তারপর লুচি ভেজে খাওয়া। নাত-বউটি খেতে বলল, 'দাদু, খাদ্য বস্ত্র বিধাতার কৃপা'।

কিসের কি বলতে পারবনি কিন্তু লাইন চলে গেলে নানা হ্যাপা। শ্যালো বন্দ হয়ে গেল। পাঁচকাঠা আলুবাড়ির চার কাঠাতে জল, এক কাঠাতে খরা। আবার লাইন এলে তবে বাকি কাজ সারা কাঠকলের আশুদগুঁড়িটি পেট পর্যন্ত ফাড়া পড়ে থাকল। গমগুলি এককুট হয়ে মেসিনের পেটে ঝিরেন নিচ্ছে। এখন পোলট্রিতে ডিমে তা দেয় বিদ্যুতের ডুম। লাইন চলে গেলে বাচচাগুলি আর্ধেক হয়ে পড়ে রইল। তবে শহরে এসবের ঝামেলা নাই। কিন্তু সেখানে অন্য বিপদ। একটি বাড়ি দক্ষিণমুখী তো তিনটি উত্তরদুয়োরী। মাথার হাওয়া থেমে গেলে ঘরগুলি উনোন। তোমার ঘরখানি দক্ষিণমুখো হলে চিন্তা নাই। উত্তরদুয়োরি হলে দক্ষিণে জানালা কাটানো দরকার। তবে শহরের ব্যাপার তো। পাশের ঘরটি গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লে কি উত্তর কিবা দক্ষিণ। বছর তিরিশ আগে একবার চোখ কাটাতে গেসলুম কলকাতায়। গ্রামের কালী চক্রবর্তীর বাড়িতে ছিলুম। দক্ষিণে জানালা নাই দেখে অবাক হলুম। জিজ্ঞেস করতে বলল জমি কম ছিল বলে এক দেয়ালের দুপাশে দুটি সংসার। তাতে ছাড় কম পড়েছে। ছাড়ও কম হাওয়াও কম। পাঁঠা মাংসের আর্ধেক দাম মুরগীর। ঝোলের বর্ণ-গন্ধও আর্ধেক।

তবে সব সময় যে বিদ্যুৎ দপ্তরের দোষ তা না। গতবছর বোশেখ মাসে খুব গরম পড়েছিল। গাছের পাতাটিও নড়ে না। দক্ষিণেও হাওয়া নাই। দুপুরে রোদের হলকাতে মুখ পুড়ে যায়। পুকুর কাটতে গিয়ে তিনজনা মাথা ঘুরে পড়ে গেল। এক বোষ্টমী কৃষ্ণের নাম নিতে গিয়ে সেই যে মাথা ঘুরে পড়ে গেল আর উঠলনি। যেমন গরম তেমন লোডশেডিং। বিদ্যুৎ আসে আর চলে যায়। গ্রামের কুয়োগুলো শুকিয়ে কাঠ। একখানি শ্যালোর ওপর সারা গাঁয়ের জলের যোগান। লম্বা লাইন পড়ে গেছে। লাইন এলে লোকে এক বালতি জল ভরে। পরের বালতি দেবার আগে আবার চলে যায়। খানিক পরে এই আসে সেই যায়। লোকজনের মাথা গরম। হঠাৎ কে একজন এসে খবর দিল ডোমপাড়ার লাইন-ঘরটিতে হনুমান উঠেছে। লোকজন ছুটে গেল। গিয়ে দেখে একটা হনুমান লাইনের ওপর বসে খিলটি নামাচ্ছে আর তুলছে। মনে হয় পায়ে লেগে নেমে গেসল। আওয়াজ শুনে মজা পেয়েছে। তাতেই নামায় আর ওঠায়। তারপর ঢিল ছুঁড়ে হনুমান নামানো। তারপর থেকে লাইন যাওয়া-আসা করলে মানুষজন লাইন-ঘরে ছুটে যায়। কিন্তু হনুমান আর আসেনি।

সোনিয়া মা, জীবজন্তু রঙ্গ করবে কিন্তু শয়তানি করবেনি। সেটি করবে মানুষজন। লাইন আছে কিন্তু দেখবে পাখার ডানাগুলি গোনা যাচ্ছে। কারণ কি ধানকল-তেলকলের লাইনগুলি ঘরসংসারের সঙ্গে জুড়ে দিচ্ছে। কলের তেজ বেশী ফলে ঘরের আলো সেই আগের লণ্ঠন-হ্যারিকেনের মতো, কিন্তু তার জন্যে দামে রেহাই নাই। এটি লক্ষ্য রাখতে হবে। যে মাসে আর্ধেক দিন লাইন নাই সে মাসেও আড়াইশ টাকা, যে মাসে আঠের দিন নাই সে মাসেও আড়াইশ। গিয়ে ধরলুম নিখিল চৌধুরীকে। সে ছোকরা আমাকে বলে কাঁটা যেমন ঘুরবে তেমন বিল হবে। আমি বললুম কাঁটাতে পাসান আছে কিনা দেখাও তো সোনা। তখন বেরিয়ে পড়ল ঘরে বসে বিল করেছে। শালীর বিয়েতে গেসল বলে মিটার দেখতে পারেনি। ধরা পড়ে বলে, 'জ্যাঠা, পরের মাসে তোমার বিল কমিয়ে দেব'। ব্যাপারটি বুঝে দেখ মা। ওর বাবা আমাকে জ্যাঠা বলত, ছেলেও বলছে। বললুম, 'বাবা আর ছেলে দুজনারই জ্যাঠা হলে বিল তো এক হবেই।' তারপর থেকে মিটার দেখতে এসে হাঁক দেয়, 'দাদু, রিডিং নিচ্ছি। দেখবে তো দেখে যাও।' তোমাকেও বলি, মা, মিটারে চোখ রাখবে। নিজে না দেখলে বিশ্বাস নাই, বাড়িয়ে দেবে। এদিকে লোডশেডিং, ওদিকে মিটার উঠছে।

আর একটি বিষয় বলে রাখি - আলো-পাখা নেভানোর দিকে চোখ রাখবে। চালানোর লোকের অভাব নাই, বন্ধ করার

সময় কাউকে মিলবেনি। আলো জ্বালিয়ে বউরা টিউবকল টিপতে চলে যাবে, নাতি-নাতনীরা লাইব্রেরীর বই আনতে যাবে মান্দারটি মাঠে চলে যাবে। কারো হুঁশ নাই। টাকা দেবে তো কত্তা, হুঁশের কি আছে! এগুলি লক্ষ্য রাখবে। তা না হলে দেখবে দিন কে দিন বিল বেড়ে যাচ্ছে।

আর একটি কথা। কাগজে পড়লুম লোডশেডিংয়ের কারণে দিল্লির লোকদের রক্তচাপ বেড়ে যাচ্ছে এবং ঘরে-বাইরে ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। তোমার জায়ের সঙ্গে তোমার নাকি মাঝে বেশ মনোমালিন্য হয়েছে। বাজপেয়ী মশাইয়ের সঙ্গে লালকৃষ্ণবাবুর সম্পর্কটিও ভাল যাচ্ছে না। লাইন না থাকলে অনেকসময় এমন হয়। পরে ধাতে সয়ে যাবে। আমাদের সয়ে গেছে। তবে মনে বেশী চাপ পড়লে দিনে তিনবার ক্যালি ফস সিক্স এক্স খেতে পার। বায়োকেমিক ওষুধ। সাতদিন খাবার পর তিনদিন বাদ দিয়ে আবার সাতদিন। তাতেই সেরে যাবে। এ্যালোপাথি ওষুধের দাম বেশী দুর্বলও করে দেয়। হোমিওপাথিতে সে ভয় নাই। তবে হঠাৎ হঠাৎ মাথা ধরলে ওষুধের পাশাপাশি তেজপাতা বেটে দুই রগে প্রলেপ দিলে উপকার পাবে।
সাবধানে থেকো মা, সুখে থেকো। ভগবান তোমাদের মঙ্গল কন।

গ্রাম ও ডাকঘর ঃ গেলিয়া
জেলা ঃ বাঁকুড়া, পিন - ৭২২১৫৪

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com